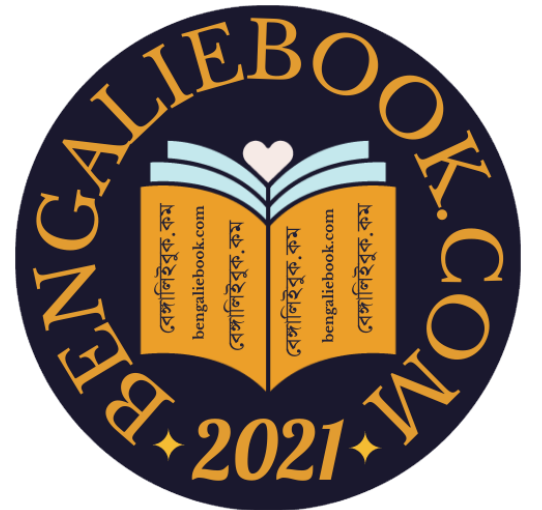


গল্প

ছিনিয়ে খায়নি কেন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



ছিনিয়ে খায়নি কেন

দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু?

এক জন নয়, দশজন, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্বা দিয়েছে ফেলে-দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরিতরকারি, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন, লুকানো গুদামে চালের পাহাড়, বড়লোকের ভাঁড়ারে দশ-বিশ বছরের ফুড-ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোতকা গাঁয়ের হোঁতকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে

উঠে যে চাল ডাল তেল নুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হ্যাঁ, মাছ-মাংস, দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কী ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হত। শুধু চাল কাড়া-আকাঁড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেল-নুন এসব দশটা জিনিস তো চায়নি যারা না-খেয়ে মেরেছে। শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে। গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত নেতিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণটা নিয়ে জীবন্ত থাকে।

চালার বাইরে ক্ষেতখামার আম-জাম কাঁঠাল-ঘেরা খড়ো ঘরগুলোতে বেলাশেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে। তামাক,

আড়াল খোঁজেনি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘরেও বসেনি। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে থেলো হুকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে খুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোক ভয়ে কাঁপে। যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলেনি তার সঙ্গে। বেঁটেখাটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি-ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয়তো হেঁটে দিয়ে থাকবে কদমছাটা করে, এখনো বড় হবার সময় পায়নি। এদেশের রণ-পা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া, বড়লোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরিবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালি, ধূর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনীতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁতকপাটি লাগত, হৃদয় শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হত স্ত্রীলোকের। বড়লোকের টাকা লুটে তারা গরিবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথেঘাটে মুমূর্ষর, সুযোগমতো চুরি-ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশি খালে সরকারি। চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু-বছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন-যে কথা বলছিলে?

ও, হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায়নি, শুধু আমি, একমাত্র আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা-সেটা বলেন, বড় বড় কথা। আবোল-তাবোল লম্বাচওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক। বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু বলবেন কী। এক বাবু বললেন,

বেশিরভাগ তো গরিব চাষি, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোনোকালে বেআইনি কাজ করেনি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে বাবু। সাধ যায় না, চাছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানডা মলে দিতে? বেআইনি কাজ, বেআইনি! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করেছে কাজটা আইনি না বেআইনি, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার? মেয়ে বৌকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরি মর-মর সাথির গলা টিপে মেরে ফেলেছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন। আরেক বাবু বললেন, ওটা কী জান যোগী, ওরা সব মুখ গরিব, চাষাভুষো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না-খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কী-এই ভেবে মরেছে না-খেয়ে, লুটেপুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেনি। শুনেছেন বাবু কথা, আঁতজ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসেসব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত-পা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয়নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বৌ, বোনসুদ্ধ? ছুটে যায়নি শহরে, বাবুদের রিলিফখানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি? আরেক বাবু বললেন-

বাবুরা কী বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বলল। শোনে না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কী? না আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি, জমিজমা তো চিরজন্মই বেচে আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড় আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের

অভ্যেস। আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না-খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনাতেও এই পুরনো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয়নি।

বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দুটো কি তিনটে দোকানে। সাত দিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয়তো মিত্যু নিচ্চয়। অত সব নয় না-ই জানল, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানি দূর-দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য জায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন কত দেখেছি সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট করতে কি ওরা জানত, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুঁড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।

ডাকতেছ?

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালোপেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতী। মনে হল, যোগীর উদ্ধার-করা মেয়েদের একজন নয় তো? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দুবছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন-চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

তামাক দে।

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

আমার পরিবার, যোগী বলল, হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এক মাস দেড় মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জোছনা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা বলছিলাম বাবু। সর্বনাশা দিনগুলোর কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বন্ধনা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে তোক পথেঘাটে মরছে দেখে মনে বড় কষ্ট। আর গায়ে জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা জোতদার, নন্দ আড়তদার, সরকারি কর্তা করিম সায়েব, পুলিশবাবু- এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলোয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে? গরুছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে ক্ষেতে ঢোকে, মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কী? ধান-চাল লুট করি দু-এক জাগায়, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু-চার জনকে নিয়ে লুটেপুটে কটাকে খাওয়াব? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোনোকালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকাব না, মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি, মারধর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারিনি বাপের জন্যে, বাপ যদি জন্ম দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙে দিয়েছি ফের। টাকা-পয়সার বদলিতে ধানচাল লুটের জন্যে দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার গেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধানচালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাশা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সী, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাও কী মারব বলুন, চুক-ছাক দু-দশ মণ চাল তো পেলে কেড়ে নি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে-না-করতে ফুরিয়ে যায়। দেশজুড়ে সবার পেটের চামড়া

চামচিকে, কজনকে দেব আমি? ভাবলাম দুত্তোর! এ শখের কেদানি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দুমুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না-খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে আমার গরজ! না, কী বলেন বাবু?

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে-আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কলকে এনে দেয়। কলকের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোতা লম্বাটে মুখে। মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোনো ছাপ চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

সেই থেকে বসে আছেন, যোগী বলে কলকেটা হুকোয় বসিয়ে, তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরিবের ঘরে। দুটো চিড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া?

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভব করে বলি, খাব না? এতক্ষণ বলতে হয়। জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কী ব্যাপার, মুড়ি চিড়ে কিছু কি নেই যোগীর, খেতে বলছে না। যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিঁচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুঁজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্তের অভাব তো ভোগ করিনি কোনো একটা দিন দু-চার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর। আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোথেকে এল। ঝোলের মতো ট্যাকটেকে পাতলা খিঁচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে, হারামজাদা, তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা। মেয়েছেলে দু-একটা দেখেশুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সঙ্গতি আছে অন্তত দু-চার বেলা খাবার-চুপিচুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহরে দূরতে বেরুবার সময় হয়তো-বা দেখে ফেলতে পারে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে কটার রকম দেখে।

মেয়েছেলে। হাড়ে জড়ানো সিটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধ-ওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো, খোঁচানো হাড়ি। আর কী দুর্গন্ধ গায়ে, পচা হুঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া জোগাড় করা পেট ভরে।

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিড়ার মোয়া আর ছোটখাটো নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড় সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙা ছিপছিপে-তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাজে ছোট মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম-খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর। ওর দিকে তাকিয়েই বলে, বাবুকে কি রান্ধস ঠাওরালি নাকি, আঁ? দুটো মোয়া, দুটো। নাড় রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কী হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসি থেকে জল এনে দে ঘটিতে। একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত সে বলে তার পরিবারকে, মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।

মাছের তরে মরছি। বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝংকার দিয়ে।

সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো, আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছ তো, মোদের খিঁচুড়ি ভোগের জন্য যে চাল ডাল আসে তার বেশিরভাগ চোরাগোষ্ঠা হয়ে যায়, নইলে খিঁচুড়ি এমন নুন জলের মতো লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কর্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব! কেড়ে খাই এসো। এমনিভাবে কত করে কত রকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, আঁ, আঁ, কী বলছিলে? বলে আবার ঝিমোয়, জলো খিঁচুড়ি এক চুমুকে খাবার খানিক পরে যদি-বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অল্প থাকতে তারা না-খেয়ে মরবে এ ভারি অন্যায-বিকালে তারা নিব্বুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি

দিতে আঙুপিছু নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, ছোট এক মগ সেদ্ধ চাল ডালের ঝোলার জন্যে-ছিনিয়ে নিয়ে। পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারো উৎসাহ দেখি না।

একদিন খবর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটামতো সরকারি চালান আরেকটা এয়েছে এ্যাদিন পরে, সাত দিন কেন পুরো আধ মাস সত্যিকারের ঘন খিঁচুড়ি বিলানো চলবে। কিন্তু দেখে শুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিঁচুড়িও সত্যিকারের খিঁচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশিরভাগ চলে যাবে। চোরাবাজারে। সদরে জানাচেনা লোক ছিল কটা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, হ্যাঁচড়, গুণ্ডা বজ্জাত, চোরাগোষ্ঠা ছোরামারা-গোছের লোকের সর্দার কজন আর কি। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারি বেসরকারি বড়কর্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর ক-বছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম। দু-দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাতুর। ওর মারফতে আর দু-চার জনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাওতা মেরে কাণ্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইস্তিশানে। চাদিকে হইচই পড়ে গেল। চালানি চালডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি।

বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু পুরো চারটে দিন ঘন খিঁচুড়ির সাথে একটা করে আলুসেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই। আদেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিঁচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ শালার ব্যাটা শালা। আর এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দু-বেলা এক মগ চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দু-বেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। পরের

দিন তাদেরই কজন আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজি, নিজেরা বেঁধেবেড়ে খাবে। আমি অ্যাদিন জপাছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কীভাবে কোথায় কী করতে হবে গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

কী বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কী, এমন আবোলতাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওয়ালা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমনভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই-না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে যাওয়াটা কদিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদেক মাল। পরদিন সেই রং-করা জলো খিঁচুড়ি।

তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ-দেড়েক মাগীমদ্ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধানচাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ সা-র গুদামে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগবাটোয়ারার মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদামে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিস টদিস নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কীভাবে কী মতলব করেছি সা-র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এল কেমন মনমরা ঝিমানো মতন।

পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জলো খিঁচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মশগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই।

সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না-খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। এক দিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকায় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু-চার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কী। এ তো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শান্তরে বলে নি বাবু, অন্ন জল প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয় না বলদ জমি চষে? কয়লা না-খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে? মহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না-খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কী, গর্তের মুখে পুতুলের মতো জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলো দাঁতে কাটছে হুঁদুর। মুনি বললে, করছ কী তোমরা সব, হুঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলো বললে, বাপু, মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দ্যাখো-নিচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারালো দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্ম মশায়। বিয়ে করো, পুতুর। জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্ট মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো তিনটে, গভ হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, এ কী কাণ্ড বলো তো বৌ, তুমি বাজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝংকার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, এক রাত্তির খেয়ে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে-করা বৌয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বৌ তুমি বাজা নাকি। নজ্জা করে না? না-খেয়ে না-খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছ। শক্তি নেই, ক্ষেমতা নেই, বৌকে বাজা বলতে নজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝে নি, সেটা চট করে। বুঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি, লুচি-মাংস, পোলাও-কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বৌ-

রাত হয়নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ? যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্যি কি মিথ্যা জানি না, মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন-চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জোছনায় গৈঁয়ো পথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না খুব কম করেও কটা মাস অন্তত লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়েতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলোর বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচা মাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়ে যাই। যোগী সামলে-সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাব-নিকাশ। বিশেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশি হতে নারাজ যে, বৌ তার যে-ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজীবনে খেয়ালে-যেসব খেয়াল তাদেরই মানায়, তাদেরই ফ্যাশান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে-অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো? তারপর আর কোনো কথা আছে?